চতুর্থ অধ্যায়

মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যের কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণ

বাংলা সাহিত্যে ভাগবত অনুসারী যতগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়, তার পথ-প্রদর্শক হিসেবে আমরা মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-কে প্রথম স্থানে রাখতে পারি। কারণ ভাগবতের অনুবাদ হিসেবে ‘গুণরাজ’-কৃত এই কাব্যই সন-তারিখ যুক্ত প্রথম কাব্য। কিন্তু গভীর ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠ করলে দেখা যায় যে, মালাধর বসু প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন নি, তিনি করেছিলেন অনুসরণ। শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করে তিনি স্বাধীনভাবে কাব্য রচনা করেছেন। অনুবাদ বললে যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হল, মূলের হুবহু ভাষান্তর। কিন্তু দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের হুবহু ভাষান্তর নয়। তাই মালাধর কৃত ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’-কে ভাগবত অনুসারী বলাই যুক্তিযুক্ত। আমরা জানি, শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনের মূলত দুটি দিক-- একটি ঐশ্বর্যলীলা আর অপরটি মাধুর্যলীলা। ‘The idea of the Holy’-গ্রন্থের লেখক Rudolf Otto ও ভগবানের দুটি বিভাবের কথাই উল্লেখ করেছেন— ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। মালাধর মূলত ঐশ্বর্যভাবের কবি। তাই তিনি তাঁর কাব্যে কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্যভাবযুক্ত বিষয়গুলিকেই অনুসরণ করেছেন। কৃত্তিবাস যেমন রামের জীবন-কথা অবলম্বন করে অনেকটা স্বাধীনভাবে বাঙালি গৃহের উপযুক্ত করে ‘রামায়ণ’ রচনা করেছিলেন, মালাধরও তেমনি কৃষ্ণের চরিত্রকথা ‘ভাগবত’ অবলম্বন করে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ রচনা করেছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের অঙ্গিরস যেমন ছিল বীররস, মালাধরও তেমনি স্বীয় কাব্যের প্রধান উপজীব্য করেছেন বীররসকে। প্রাক-চৈতন্য যুগের সাধারণ বাঙালি পাঠকেরা ভাগবতের নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ না হবার কারণেই মালাধর পাঁচালি আকারে তা রচনা করেছেন, একথা তিনি নিজের কাব্যে প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

মালাধর বসু কৃষ্ণলীলাকে বাঙালির ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছেন। তাই তাঁর বর্ণনায় দেখা যায়— শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে পাত পেতে ভাত খেয়েছেন। আমরা দেখি মথুরায় গুয়া, জলপাই, কামরাঙার গাছ, দুয়ারে দুয়ারে নারিকেল গাছের সারি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বাৎসল্য রসের বর্ণনার আতিশয্য নেই। আমরা দেখি কবি সহজ-সরল ভঙ্গিতে অত্যন্ত সাবলীলভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কথা বর্ণনা করে চলেছেন। ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যের অনেকটা অংশ জুড়েই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-ভাব প্রকাশিত। সেই

কারণেই এই কাব্যে যুদ্ধের বর্ণনা বিস্তৃত আকারে রয়েছে। প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরকে অবলীলাক্রমে পরাভূত করার ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভগবানের ঐশ্বর্যই প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই কারণেই কবি উদ্ধব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় ধর্মমতে ও সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে যে একটি বিশিষ্ট উন্মাদনা ছিল, তারই অনুপম প্রকাশ যেমন আমরা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ দেখি, তেমনি বাংলা কাব্যকুঞ্জে তার কলধ্বনি পাওয়া যায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গানে। সেই একই ধারা প্রবাহিত হয়েছে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান রূপে স্বীকৃত। কিন্তু গৌড়ীয় ধর্মের এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য মালাধরের পরবর্তীকালের ব্যাপার। কেননা, শ্রীচৈতন্যই এই তত্ত্ব নিরূপণ করেছিলেন জানা যায়। যদিও দেখা যায়, মালাধর অনেক আগেই এর জন্য জমি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলতে শোনা যায়—

"তুমি দেব নিরঞ্জন দেব প্রজাপতি।
তুমি দেব মহেশ্বর তুমি উমাপতি।।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি তারাগন।
তুমি দিবা তুমি রাতৃ দণ্ড প্রহর ক্ষণ।।
তুমি জপ তুমি তপ তুমি জজ্ঞদান।
তুমি জোগ তুমি ভোগ পরম গিয়ান।।
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ন।
তোমার নিদ্রা সে নিন্দ্রা জাগিতে জাগরন।।
নির্লেপ গোসাঞি তুমি করিলে গর্ভবাস।
সেবক বৎসল তুমি করিলে প্রকাশ।।
মোহিয়া অসুর মার মানুস সরিরে।
পৃথুবির ভার হর মারিয়া অসুরে।।"[১]

আমরা দেখতে পারি যে, উপরিউক্ত অংশে ভগবানের একেশ্বরবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি স্পষ্ট রূপে অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের স্রষ্টা একথাও বলতে ভোলেন নি যে, পৃথিবীর ভার হরণ এবং অসুর দলনই ভগবানের অবতারের মুখ্য কারণ।

আমরা জানি, মধ্যযুগে ভাগবত আস্বাদন চলত সাধারণত দুটি পথে। এক, ভক্তিগ্রাহ্য পথে, এবং দুই, বুদ্ধি যোগে। কিন্তু ভক্তি যখন জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করল তখন থেকেই তার স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের বিষয় হল। ভক্তির অনেক প্রকার সংজ্ঞা শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা আছে। কিন্তু ভক্তি অর্থে যখন 'প্রেম' অবধারিত হল, তখন থেকেই তা বৈষ্ণবগণের কাছে এক উচ্চ স্থান লাভ করল। এই প্রেমের দ্বারাই ধর্মমত এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে প্রভাবিত হল। আমরা জানি প্রেম মানব মনের সর্বাপেক্ষা কমনীয় প্রকাশ। এই প্রেম-ভক্তির দ্বারাই বৈষ্ণব সাহিত্যে কান্তাভাবের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। এই কান্তাভাবের পূর্বাভাস পাওয়া যায় মালাধরের কাব্যে। যখন তিনি বলেন—

"বাসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"[২]

কিন্তু এই কান্তাভাবের সূত্রস্বরূপ একটি মাত্র পংক্তি মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পাওয়া গেলেও তিনি এর কোন সবিস্তার বর্ণনা দেননি। এই একটিমাত্র পংক্তি মালাধর শুধুমাত্র কাব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য রাখেন নি; এর পিছনে নিশ্চয়ই তাঁর কোন উদ্দেশ্য ছিল। যদিও গোপীপ্রেমের মহিমা শ্রীচৈতন্যের পূর্বে উপলব্ধি করা সহজ ছিল না। আর সে কারণেই কৃষ্ণ যেখানে বিশেষ গোপীকে নিয়ে রাসমণ্ডলী থেকে অন্তর্ধান করেছিলেন, মালাধর সেখানেও রাধা নাম দিতে পারেন নি।

কবি মালাধর কৃত ভাগবত অনুসারী কাব্যটির নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। মূলত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম এবং একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করে তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধ নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনাগুলির মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব এবং মাধুর্যভাব দুটিরই প্রকাশ ঘটেছে। ঐশ্বর্যভাবে রয়েছে— ভগবানের ভগবৎলীলা আর মাধুর্যভাবে গোপীলীলার প্রকাশ। কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্যভাব বহু প্রাচীন, আর মাধুর্যভাব অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। ভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা চারটি স্থানে সংঘটিত হতে দেখা যায়। এই চারটি স্থান হল- ব্রজভুমি, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা। দশম স্কন্ধ কৃষ্ণের জন্ম ও তৎসংক্রান্ত নানা কথা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। তারপর ব্রজভূমিতে কৃষ্ণলীলার নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা। এরপরেই রয়েছে বৃন্দাবনলীলা। বৃন্দাবনেই ভগবানের গোপীলীলা বর্ণিত। বৈষ্ণব কবিগণ নানাভাবে এই মধুরতম গোপীলীলা আস্বাদন

করেছেন ও বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব ও মধুরভাব দুয়েরই প্রকাশ রয়েছে। অতএব, বৃন্দাবনলীলা কৃষ্ণলীলার উল্লেখযোগ্য বিষয়। এরপর কৃষ্ণের মথুরালীলা। মথুরালীলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংস-বধ। সবশেষে রয়েছে দ্বারকালীলা। কৃষ্ণলীলার বিচিত্র সব ঘটনা এই দ্বারকালীলাতেই সংঘটিত হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থখানি পাঠ করলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ এই তিন ভূখণ্ডেই কৃষ্ণের বীরত্ব নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বৃন্দাবনলীলা অপেক্ষাকৃত কম প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের মনে হয়, মালাধর তাঁর কাব্যে ঐশ্বর্যলীলাকেই মুখ্য করার কারণে বৃন্দাবনলীলাকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। বৃন্দাবনলীলায় বীরত্ব অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রেমলীলা অধিক দেখা যায়। আর এই প্রেমলীলা মূলত গোপীলীলাকে কেন্দ্র করেই। যেহেতু মালাধরের লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা বর্ণনা তাই তিনি গোপীলীলাকে কিছুটা এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে বৃন্দাবনলীলার মূল ঘটনাগুলি তিনি অনুসরণ করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকে উপজীব্য করে গুণরাজ খান যে কাব্য লিখেছিলেন, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য কবি এখানে অপ্রয়োজনীয় অনেক ব্যাপার বাদ দিয়েছেন। অনেক জায়গায় স্তব-স্তুতি তিনি সংক্ষেপে বলে এগিয়েছেন, অনেক দার্শনিক তত্ত্বও বাদ দিয়েছেন। এমনকি, মূল ভাগবতে বর্ণিত কবিত্বপূর্ণ রসঘন বর্ণনাও তিনি বর্জন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এই প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন —

> "শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। অনুবাদ হইলে কবির মৌলিকতার পরিচয় প্রদানের অবসর অল্পই ঘটিত। অনুবাদ হিসাবে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কবি হিসাবে মালাধরই শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী। মালাধর কাব্যরস পরিবেশন করিয়া ভাগবতকে জনপ্রিয় করিতে প্রয়াসী ছিলেন, এজন্য তিনি ভাগবতের অনেকাংশ ইচ্ছামত বাদ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার মূল ঘটনাগুলি প্রায় সমস্তই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় তিনি মূলের আনুগত্য করিয়াছেন, কোথায় বা বাদ দিয়াছেন, কোথায় বা ভাগবতের উপরেও রঙ ফলাইয়াছেন তাহা না জানিলে মালাধরের কাব্যের প্রকৃত মূল্য আমরা দিতে পারিব না।"[৩]

এযাবৎ যতগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে তার উৎস-গ্রন্থ মূলত ভাগবত। কিন্তু একথা বলা হয়তো ঠিক হবে না যে, শুধুমাত্র ভাগবত কাহিনিকেই অবলম্বন করে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি গড়ে উঠেছে। দেখা যায় য,, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কবি মালাধর বসুও কাব্যারম্ভে একথা স্বীকার করেন নি। বরঞ্চ তাঁর স্বীকারোক্তিতে একথাই প্রকাশিত হয় যে, তিনি ভাগবত কাহিনির বাইরে কোনো কিছুই বলেন নি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই কবি জানিয়েছেন—

"ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।

লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।"[৪]

অথচ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যখানি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করলে আমরা ভাগবত বহির্ভূত নানা কাহিনির সমাবেশ লক্ষ্য করি। তাহলে এখানে প্রশ্ন হল— এই রকম ঘটনা ঘটবার কারণ কি ? তাহলে কি কবি কথার ছলেই এইসব কথা বলেছেন ? এক্ষেত্রে বলতে হয় কৃষ্ণমঙ্গল পাঁচালিগুলি গড়ে উঠেছে কৃষ্ণকথা অবলম্বন করে। আর কৃষ্ণকথা শুধুমাত্র যে ভাগবতে আছে তা নয়; বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশেও কৃষ্ণকথা রয়েছে। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনার সময় শ্রীমদ্ভাগবত কবির উপজীব্য হলেও কাহিনি বয়নের সময় অন্যান্য পুরাণের কৃষ্ণকথা চলে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার এটিও হতে পারে যে, কৃষ্ণলীলার কাহিনিকে প্রাকৃতজনের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কবি অন্যান্য পুরাণ থেকে বা লোক প্রচলিত কৃষ্ণলীলা থেকে উপাদান গ্রহণ করেছেন। আসলে পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে মালাধর ভাগবতের অনুবাদ করলেও তিনি যুগ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। মালাধরের অনূদিত গ্রন্থের অবলম্বন যদিও শ্রীমদ্ভাগবত তবুও বলতে হয় কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণে তিনি অদ্ভুত কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

মালাধর সাধারণত ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্ধের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। দ্বাদশ স্কন্ধের কাহিনি বর্ণনা করেন নি এমন নয়, সেখান থেকে 'কলি ধর্ম কথন' অংশটি তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এমন কতগুলি কাহিনি তাঁর কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি মূল ভাগবতে নেই। আবার কতগুলি কাহিনি তিনি বর্ণনা করেছেন যেগুলি মূল ভাগবতে খুব সংক্ষেপে রয়েছে, কিন্তু তিনি বিস্তারিত ভাবে তাঁর কাব্যে রেখেছেন। আবার এও দেখা যায়, এমন কতগুলি কাহিনি মূল ভাগবতে রয়েছে যেগুলি মালাধর তাঁর কাব্যের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে তা পরিত্যাগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবত বহির্ভূত কী কী কাহিনি জায়গা পেয়েছে, কোন কোন কাহিনি বিস্তারিত আকারে রয়েছে এবং কোন কোন

কাহিনি তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন এই বিষয়গুলিকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত, ভাগবতে নেই কিন্তু মালাধর বসুর কাব্যে রয়েছে অর্থাৎ যে কাহিনি ভাগবত বহির্ভূত।

দ্বিতীয়ত, ভাগবতে আছে কিন্তু মালাধর বসু তাঁর কাব্যে স্থান দেননি।

তৃতীয়ত, ভাগবতে রয়েছে কিন্তু সংক্ষেপে। মালাধর তাঁর কাব্যে বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

চতুর্থত, ভাগবতে রয়েছে অনেকটা বিস্তারিত ভাবে কিন্তু মালাধর তা সংক্ষেপে লিখেছেন।

এবার একে একে বিষয়গুলিকে কাহিনি গ্রন্থনার দিক থেকে আলোচনা করা হল।

ভাগবত বহির্ভূত কাহিনি

মালাধর বসু বা গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে গ্রন্থের মধ্যে বহু জায়গায় ভাগবত বহির্ভূত কাহিনির মিলন-মিশ্রণ দেখা যায়। এই কাহিনিগুলি কখনও অনেকটা অংশ জুড়ে আবার কখনও ছোট ছোট অংশে কাব্যে স্থান পেয়েছে। ভাগবত কাহিনির মধ্যে এই সংযোজনগুলি কাহিনির অগ্রগতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমরা কাহিনি বিশ্লেষণ সূত্রে সেই অংশগুলি উপস্থাপন করছি --

মঙ্গলকাব্য রচনার বৈশিষ্ট্য মেনেই মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি রচিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতেই বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা অংশ রয়েছে। তারপর গ্রন্থের বিষয় নির্দেশ হিসেবে লোক নিস্তার ও কলিযুগের অন্ধকার মোচনের জন্য ভাগবত কাহিনি লৌকিক ভাষায় বর্ণনার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। এরপরেই মালাধর তাঁর কাব্যে 'সর্ব্বলীলা' অংশটি রেখেছেন। সেই অংশটি মূল ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় থেকে গৃহিত। যেখানে ভগবানের বিভিন্ন অবতার ও সেই সব অবতারের কারণ অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপরেই কাব্যে সমস্তলীলার একটি সূচী রাখা হয়েছে। তারপরেই মালাধর মূল কাব্যে প্রবেশ করেছেন।

প্রথমে রয়েছে পৃথিবীর রোদন এবং অসুরদের অত্যাচারে ভারাক্রান্ত পৃথিবীর ব্রহ্মার শরণাপন্ন হওয়ার কাহিনি। পৃথিবীর দুঃখকথা শুনে ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতাগণ পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণের নিকট উপস্থিত হন প্রতিকারের প্রার্থনায়। সেই সময় আকাশবাণী হয় -- শ্রীভগবান পূর্ব থেকেই পৃথিবীর সংবাদ অবগত। তখন নারায়ণ ব্রহ্মাকে অভয়দান করেন এবং ভারাবতরণে হরির জগতে অবতরণের কথা বলেন। এরপরেই কংসের উদ্যোগে বসুদেবের সঙ্গে দেবকীর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং বসুদেব মধুপুরী গমন করেন। ভগিনীর বিবাহের পর যখন কংস বন্ধুজন পরিবৃত হয়ে পায়চারী করছিলেন তখন দৈববাণী শোনা যায় —

"সুন কংস অদ্ভুত কথা।

দৈবকী উদরে তোর অষ্টম গর্ভে ঘোর

মৃর্ত্তু রূপ উপজিব তোথা।।"[৫]

এই কথা শুনে কংস ভয়ার্ত চিত্তে ভগীনিকে বধ করার জন্য উদ্যত হল। কিন্তু বসুদেব তখন তাঁকে এই পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যখনি তার সন্তান জন্মাবে তিনি সেই শিশুকে কংসের কাছে দিয়ে যাবেন। এই ঘটনার পর বসুদেব স্ব-স্থানে ফিরে এসে রোহিণী দেবীকে বিয়ে করেন। কালক্রমে দেবকী দেবীর প্রথম গর্ভ ধারণের খবর রাজা কংসকে দেওয়া হল। যথা সময়ে বসুদেব ও দেবকীর পুত্র সন্তান হল। আগের প্রতিশ্রুতি মতন বসুদেব পুত্র কোলে করে কংসের নিকট উপস্থিত হলেন। কিন্তু সুন্দর শিশু দেখে কংসের দয়া হল এবং তিনি বললেন যে, আকাশবাণী অনুযায়ী এই শিশু থেকে আমার ভয়ের কোন কারণ নেই। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান আমাকে এনে দেবে। তুমি নিজের সন্তান নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। এইভাবে একে একে দেবকী ও বসুদেবের ছয় পুত্র জন্ম নিল। মালাধরের বর্ণনা এখানে খুব সহজ সরল ও সাবলীল—

"উপনিত পুত্র লৈয়া কংস বরাবরে।

সুন্দর দেখিয়া কংস দয়া কৈল তারে।।

ইহা হৈতে ভয় মোর না হৈল বানি।

দৈবকীর অষ্টম গর্ভ মোরে দিহ আনি।

লৈয়া জাহ ঘরে তুমি আপন কুমার।

তাহা লৈয়া গেলা বসু আপন দুয়ার।।

তাহা না মারিল রাজা কংস নরপতি।

তিন চারি পাঁচ ছয় হইল উৎপতি ।।

ছয় জন না মাইল কংস মহাসএ।

হেনকালে নারদ মুনি আইল তথাএ।।"[৬]

কিন্তু ভাগবতের বর্ণনা এখানে একটু অন্যরকম। ভাগবতে দেখা যায়— বসুদেব-দেবকীর প্রথম সন্তানকে বধ করা থেকে যখন কংস বিরত থাকেন তখনি সেখানে নারদ মুনি এসে উপস্থিত হন। নারদের মুখে নিজের বিপদের কথা শুনে কংস তাঁদের প্রতিটি পুত্রকেই হত্যা করেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ে ৬৫ ও ৬৬ শ্লোকেই আছে যে, কংস বসুদেব-দেবকীর ছয় পুত্রের জন্ম নেওয়া মাত্রই একে একে তাঁদের হত্যা করেছিলেন। ভাগবতের বর্ণনা এই রকম—

"ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।

দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুং চ স্ববধং প্রতি।।

দেবকীং বসুদেবং চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে।

জাতং জাতমহং পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া।।"[৭]

অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ এই সংবাদ দিয়ে চলে যাবার পর কংস নিশিত হলেন যদুবংশীয়রা সকলেই দেবতা এবং ভগবান বিষ্ণুই তাকে বধ করার জন্য দেবকীর গর্ভে জন্ম নেবেন। এই কারণে সে দেবকী এবং বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং তাঁদের এক-একটি পুত্র হওয়া মাত্রই হত্যা করতে লাগল।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ দেখা যায়, কংস দেবকীর গর্ভজাত ছয়টি সন্তানকে জন্মের পরেই হত্যা করেন নি। এই কাব্যে আমরা দেখি, দেবকীর একটি করে সন্তান জন্মাবার পরে পিতা বসুদেব সদ্যোজাত প্রতিটি সন্তানকে নিয়ে কংসের সম্মুখে হাজির হন। যখন ছয় পুত্রকে কংস হত্যা থেকে বিরত থাকেন তখন কংসের কাছে নারদ মুনি এসে উপস্থিত

হন। নারদ কংসকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার পরেই কংস সকল অসুরদের নিয়ে মন্ত্রণা করেন। মালাধর বসু লিখেছেন --

"মন্ত্রনা করিল তবে সকল অসুরে।

দৈবকীর ছয়পুত্র মারিল একুবারে।।"[৮]

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। চরিত্র নির্মাণে মালাধর কতটা সচেতন। কংস যেখানে সহজ-সরল মনে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে বধ করবে ভেবে বাকি সন্তানদের বধ করা থেকে বিরত, সেখানে নারদের মত প্রাজ্ঞ ঋষির বাণী কখনই যে ভুল নয় সে কথা তিনি অসুরদের জানিয়ে দিচ্ছেন। নারদ চরিত্রকে সঠিক জায়গায় উপস্থাপন করার ক্ষমতার জন্যই কাব্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির একটি সুযোগ ঘটেছে। এই কৃতিত্ব অবশ্যই মালাধরের প্রাপ্য।

অতঃপর কৃষ্ণের জন্ম কাহিনি। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরাম এবং অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব। দেবকীর যখন সাত মাস গর্ভ হল তখন যোগ নিদ্রায় ভগবতী তার কাছে উপস্থিত হল। নিদ্রাচ্ছলে তিনি সেই গর্ভ কেটে তা রোহিণীর উদরে প্রতিস্থাপিত করলেন। কিন্তু রাজাকে খবর দেওয়া হল দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। এই কথা শুনে রাজা খুশি হলেন। অন্যদিকে রোহিণী গুপ্ত ভাবে থাকার পর বলরামের জন্ম হল। নন্দ ঘোষের ঘরে রোহিণী নিশ্চিন্তে পুত্র নিয়ে সুখে বাস করতে লাগলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর গর্ভে এল তখন কংস ভয়ার্ত চিত্তে কারাগারে এসে তা নিজে দেখে গিয়েছিলেন, এই কথা ভাগবতে আছে। কিন্তু মালাধর লিখেছেন যে, কংস দূত মুখে ঐ সংবাদ পেয়েছিলেন—

"দেখিয়াত তেজরূপ জগতে অনুচরে।

দৈবকী উদরে গর্ভ জানাইল রাজারে।।

সুন সুন অহে রাজা কংস নৃপবরে।

দুই মাস গর্ভ হৈল দৈবকী উদরে।"[৯]

দেবকীর দশমাস গর্ভকালে বন্দীশালায় দ্বিগুণ প্রহরী নিযুক্ত করা হল। ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে শুভ অষ্টমী তিথিতে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন করে ভগবানের জন্ম হল। চারিদিকে জয় জয় শব্দ হল, নদ-নদী, সমুদ্র প্রসন্ন হল। এই প্রসঙ্গে আমরা মূল ভাগবতের সঙ্গে

মালাধরের পার্থক্য দেখতে পারি। মালাধরের কাব্যে কৃষ্ণের জন্ম বর্ণনা অতি লৌকিক ভাবে হয়েছে কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের জন্ম আধ্যাত্মিক বাতাবরণে ঘটেছে। ভগবান কৃষ্ণের প্রকাশ মালাধরের বর্ণনায় অনেকটাই ফিকে মনে হয়। মালাধরের কাব্য থেকে একটু উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে —

"সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
মকর কুণ্ডল কর্ন্নে হৃদে বনমালা
হিরামন মানিক মুকুট সোভে সিরে।
নানারত্ন অঙ্গজ বলয়া দুই করে।।
পাএতে নুপুর বাজে স্রীবৎসাদি পতি।
দক্ষিণে লক্ষ্মি সোভে বামে সরস্বতি।।"[১০]

এখানে একটি বিষয় ভাগবত বহির্ভূত। লক্ষণীয় যে, মূল ভাগবতে না থাকলেও মালাধর লিখেছেন— 'দক্ষিনে লক্ষ্মি সোভে বামে সরস্বতি'। এটি মালাধরের নিজস্ব কল্পনা। আমাদের অনুমান যেহেতু নারায়ণ বা বিষ্ণু ভাবনা থেকেই কৃষ্ণ ভাবনা এসেছে তাই তিনি বিষ্ণু-কৃষ্ণকে মিলিয়ে নিয়েই লক্ষ্মী প্রসঙ্গ এখানে এনেছেন। এরপর দেবতাগণ নারায়ণের স্তুতি করলেন। এইসব দেখে বসুদেব কি করবেন কুল-কিনারা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তখন দেবকী দেবী জোড়হাত করে নারায়ণের স্তুতি করলেন এবং কংস রাজার প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, এই পুত্র জন্মের খবর পেলেই কংস এসে পুত্রকে হত্যা করবেন এবং তারও প্রাণ নেবেন। ভাগবতে এখানে এই অংশে দেবকী ও বসুদেব দুজনেই কৃষ্ণ স্তুতি করেছিল। কিন্তু মালাধর শুধুমাত্র দেবকীকে দিয়ে কৃষ্ণ স্তুতি করিয়েছেন। তখন কৃষ্ণ তাঁকে পূর্ব পূর্ব জন্ম কথা স্মরণ করায়। তিনি বলেন ত্রেতা যুগে দ্বাদশ বৎসর বসুদেব ও দেবকী দুজনে নিরাহারে তপস্যা করেছিল, বিষ্ণুকে ভক্তি ও স্তুতি করেছিল, সেইজন্যই তিনি তাঁদের প্রতি সদয় হয়ে তাঁদের পুত্র পৃশ্নীগর্ভ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় জন্মে বামন রূপে তাঁদের ঘরেই জন্ম হয়েছিল। তখন উপেন্দ্র নামে জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখন তাঁর তৃতীয় জন্ম। এই জন্মে অসুরবধ করে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করবেন। এরপরেই তিনি বলেন যে, মহামায়া নন্দ ঘোষের ঘরে জসোদা উদরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। বসুদেব যেন তাঁকে সেখানে রেখে মহামায়াকে নিয়ে আসেন। এই সব কথা বলে কৃষ্ণ সুন্দর-সৌম্য শিশুরূপ ধারণ করলেন। কৃষ্ণের প্রবোধ বাণীর পরেই বসুদেবের নিগড় বন্ধন খুলে গেল,

প্রহরীরা সব নিদ্রা গেল, বসুদেব প্রফুল্ল-বদনে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে আমরা কয়েকটি অংশে গোকুলের নাম দেখতে পাই। প্রথম দেখা যায়, শিশু কৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে যাবার সময় এবং দ্বিতীয়ত কংসের প্রতি মহামায়ার উক্তিতে। মালাধরের বর্ণনা—

"সকল দ্বার মুক্ত হৈল প্রহরি নিদ্রা গেল।

সিসু কোলে বসুদেব গোকুল চলিল।।"[১১]

বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিত জসোদার পাশে শায়িত রেখে মহামায়ারূপী কন্যাকে নিয়ে মধুপুরি ফিরে এলেন তখন পুনরায় নিগড় কপাট সব বন্ধ হল। এরপরেই কংস দূত মুখে শুনলেন দেবকীর উদরে সন্তান জন্মের কথা। এখানে মালাধরের কাহিনি বয়নের বাস্তবতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ছোট শিশুর কান্নার শব্দে প্রহরীরা সব জেগে উঠল। কবি লিখেছেন --

"উঙা চুঙা করিয়া কান্দএ কন্যা খানি।

চিয়াইল প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি।।"[১২]

নবজাত কন্যার ক্রন্দন শুনে প্রহরীরা কংসকে জানাল দেবকীর সন্তান জন্মের কথা। এই খবর শুনেই কংস 'আউদর চুলে' কারাগারে এসে উপস্থিত হলেন এবং দেবকীর কোল থেকে কন্যা সন্তান কেড়ে নিল। দেবকী অনেক কাকুতি মিনতি করে বললেন যে, তুমি আমার ভাই হয়ে এই রকম চণ্ডালের মত কর্ম করো না। এর আগে তুমি আমার ছয় পুত্রকে বধ করেছ, তখন আমি কিছুই বলি নি । কিন্তু এবার এই কন্যা কে আর মেরো না। নারদ মুনির কথা অনুযায়ী অষ্টম গর্ভের পুত্র তোমার মৃত্যুর কারণ। কিন্তু এতো কন্যা। এর থেকে তোমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু দুষ্ট কংস তার কোনো কথাই না শুনে কন্যা কেড়ে নিয়ে শিলার ওপর দুই পা ধরে নিক্ষেপ করল। তখনই দেবী মহামায়া অষ্টভুজা রূপ ধারণ করলেন এবং কংসকে বললেন --

"তোমাতে মারিতে হৈল পুরূস রতন।

গোকুলে ত আছে সেই জন্মিল এখন।।"[১৩]

কৃষ্ণের জন্মকাহিনি অংশে লিখিত এই কথার অর্থ হল, তোমাকে যে বধ করবে সে গোকুলে বাড়ছে। ভাগবতে আমরা মহামায়াকে পেয়েছি, কিন্তু মহামায়ার উক্তিতে 'গোকুল' নামটির উল্লেখ ভাগবতে নেই। ভাগবতের দশম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

"কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।

যত্র ক্ব বা পূর্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা।।"[১৪]

এখানে 'যত্র ক্ব' শব্দ দুটি ব্যবহারের অর্থ 'কোনো এক জায়গায়'। জানা যায় 'বিষ্ণুপুরাণ', 'হরিবংশেও' গোকুলের নাম নেই। তাহলে প্রশ্ন আসা অবান্তর নয় যে, মালাধর এই নামটি কোথা থেকে পেলেন ? অনুমান করা যেতে পারে এই 'গোকুল' নামটির এখানে ব্যবহার মালাধরের নিজস্ব কল্পনা প্রসূত। জন্মের পর কৃষ্ণকে যেহেতু গোকুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং গোকুলেই সে বেড়ে উঠেছিল, সেইহেতু এই নামটি সহজেই কবির মনে জাগরূক হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়। প্রাচীনকালে লোক-মুখে বেশ কিছু প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণের জন্ম এবং কংস-বধ বিষয়ে এই ধরনের কোনো প্রবাদের প্রচলন সে সময়েও থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মালাধর সেরকম কোনো প্রবাদের উপর নির্ভর করেও 'গোকুল' নামটি উল্লেখ করে থাকতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর 'জন্মখণ্ডের' একটি অংশে গোকুলের প্রসঙ্গ রয়েছে।—

"রোহিণী আষ্টমী তিথি ল।

জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ।।

দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাণিল।

নিন্দে আকুল গোকুলের লোক ভৈল।।"[১৫]

আবার এই কাব্যেই অন্যত্র দেখা যায়--

"কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ ।

কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ।।

নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।

শুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে।।"[১৬]

এখানে 'নান্দোঘরে' বলতে নন্দ ঘোষের ঘরের কথাই বলা হয়েছে। উপরিউক্ত পংক্তিতে গোকুলের নাম না থাকলেও নন্দ ঘোষের ঘর বলতে পরোক্ষে গোকুলের কথাই বলা হয়েছে তা বোঝা যায়। যদিও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনাকালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু এই কাব্য ওই সময়ে সমাজে বহুল প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে। কবি মালাধর এই কাব্য সম্পর্কে জানতেন কিনা তার কোন নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় নি।

কাহিনির ক্রমান্বয়ে এই অংশেই বসুদেবের যমুনা উত্তরণ কাহিনি রয়েছে। এই কাহিনিটি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পাওয়া যায় একটু ভিন্ন ভাবে। কৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব শিশু কৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে গোকুলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। পথে যমুনা নদী পেরিয়ে তাঁকে নন্দ ভবনে যেতে হয়। এই যমুনা উত্তরণকালে এমন কতগুলি ঘটনা মালাধরের রচনায় পাওয়া যায় যার মূল ভাগবতে নেই; বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশেও নেই। বসুদেবের যমুনা উত্তরণের প্রসঙ্গ ভাগবতে আছে। কিন্তু বসুদেব যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছিলেন তখন যে কোন 'শৃগালী' তাঁকে পথ দেখিয়েছিল এ কথা ভাগবতে নেই। এমনকি, কৃষ্ণ যমুনার জলে পড়ে গিয়েছিল এই কথাও ভাগবতে নেই। এখন প্রশ্ন এই উপাখ্যানের উৎস কোথায় ? এই প্রসঙ্গ আছে 'ভবিষ্যপুরাণে' বশিষ্ঠ-দিলীপ সংবাদের 'জন্মাষ্টমী ব্রতকথায়'। সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই মালাধর তাঁর কাব্যে লিখেছেন—

"শৃকালির রূপে আগে জাএ মহামাএ।
ফনা ছত্র ধরিঞা বাষুকি পাছু জাএ।।
জমুনা কল্লোল দেখি পাইল তরাস।
কেনমতে ঘর জাব এড়য়ে নিস্বাস।।
না করিহ ভয় কিছু হৈল স্বর্গবানী।
শৃকালি আগে জমুনায়ে হাঁটু এক পানী।।
সেই পথে বষুদেব কইল গমন।
লাফ দিয়া জলে কৃষ্ণ পড়িলা তখন।।
হাহাকার করি বষু কৃষ্ণ কৈল কোলে।
কৃষ্ণ কোলে করি তবে গোকুলেরে চলে।।"[১৭]

এইসব প্রসঙ্গ ভাগবতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এগুলি মালাধরের নিজস্ব কল্পনা শক্তির প্রয়াস। কাহিনির মধ্যে নাটকীয়তা আনার জন্য এবং যুগ প্রয়োজনেই মালাধর এইসব কাহিনি বলে গিয়েছেন। কারণ মালাধরের লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতজন। ভাগবতের নিগূঢ় তত্ত্বকথা অনুবাদ করে গেলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা বোধগম্য করা সম্ভব হত না। তাই কাহিনির পর কাহিনি জুড়ে মালাধর শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করে গিয়েছেন। কিন্তু এই প্রচার ভক্তিকে কখনই অস্বীকার করে নয়।

এরপরেই কংস পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর, চাণূর, মুষ্টিক, কেশী, তৃণাবর্ত, প্রলম্ব বিভিন্ন অসুরদের সাথে কৃষ্ণ বধের মন্ত্রণা করেন। অতঃপর কৃষ্ণ বধের জন্য পুতনাকে পাঠিয়ে রাজা কংস একটি দারুণ অভিনয় করেন। মালাধর কৃত কংসের এই অভিনয় তাঁকে এক অন্য স্বীকৃতি দেয়। কাহিনি বয়নের সাথে সাথে মালাধরের চরিত্র সৃজনের কথাও মনে রাখার মত। এই অংশে মালাধর কাহিনিতে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য কংসের মাধ্যমে এক দারুণ অভিনয় ফুটিয়ে তুলেছেন—

"মন্ত্রনা করিয়া নড়ে কংস নরপতি।
নড়িলা পুতনা নারি সভার জুগতি।।
তবে আসি কংস রাজা বসুদেব আনি।
বন্দি ছোড়াইয়া তারে বলে পূয় বানি।।
মিথ্যা দুঃখ দিল তোমায় সুন মহাসএ।
মিথ্যাপুত্র মারিল দোস ক্ষেমহ আমাএ।।
আমাকে মারিবারে হৈল আজিকার রাতি।
গোকুলে তাহার জন্ম কৈল ভগবতি।।
না লইহ দোস মোর পড়হুঁ চরনে।
চল ঘর জাহ ভগ্নি হরসিত মনে।।"[১৮]

এরপর একে একে প্রথমে পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন কাহিনি, তারপর তৃণাবর্ত বধ। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনিকে নাটকীয় ভঙ্গিতে বর্ণনা করার জন্য কাহিনির ক্রম পরিবর্তন করেছেন। দেখা যায়, তিনি পূতনা বধের পর এবং তৃণাবর্ত, বৎসাসুর ও অঘাসুর প্রেরণের

পূর্বে বিস্তৃতরূপে কংসের দুশ্চিন্তা, মন্ত্রণা, শ্রীকৃষ্ণ বধের জন্য অন্য অসুর-প্রেরণ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এই সকল প্রসঙ্গ ভাগবতে নেই।

তারপরেই কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ প্রসঙ্গ। যদুবংশীয়গণের কুলপুরোহিত ছিলেন মহাতপস্বী গর্গাচার্য। বসুদেবের প্রেরণায় তিনি একদিন নন্দ ঘোষের ব্রজভূমিতে হরসিত মনে পদার্পণ করলেন। নন্দ ঘোষ তাঁকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানিয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তখন নন্দ তাঁকে দুটি বালকের নামকরণ সম্পাদনের জন্য অনুগ্রহ করেন। এরপরেই গর্গ মুনি দুই বালকের নামকরণ করেন। এই কাহিনি মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে। কিন্তু ভাগবতে এখানে বর্ণনা একটু অন্যরকম। নন্দ ঘোষ যখন গর্গাচার্যকে নামকরণের জন্য বলেন তখন গর্গ মুনি নন্দরাজকে বলেন যে, তাঁকে সব জায়গাতেই লোকে যদুবংশের কুলপুরোহিত হিসেবেই জানে। তাই তিনি যদি এই পুত্রদ্বয়ের নামকরণ করেন তখন লোকে এই বালকদের দেবকীর পুত্র বলেই মনে করবে। যেহেতু কংসের বুদ্ধি সর্বদাই পাপ পথে চলে আর বসুদেবের সঙ্গে নন্দের বন্ধুত্বও রয়েছে। যোগমায়ার মুখ থেকে যখন কংস শুনেছিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রের হাতে কংসের মৃত্যু হবে তখন থেকেই কংসের মাথায় এই চিন্তা রয়েছে যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কন্যা হতে পারে না। অতএব তিনি এই নামকরণ করতে পারবেন না। কিন্তু মনে মনে তাঁর নামকরণের অভিপ্রায় ছিলই। এরপর নন্দ তাঁকে গোশালায় গোপনে কেবলমাত্র স্বস্তিবচন করে নামকরণ করতে বলেন। ভাগবতের বর্ণনায় আছে—

"অলক্ষিতোহস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।

কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।।"[১৯]

অর্থাৎ আপনি একান্তে অবস্থিত আমার গোশালায় গোপনে কেবলমাত্র স্বস্তিবাচন করে এই দুই বালকের দ্বিজাতি-সমুচিত নামকরণ সংস্কার করে দিন। আমার নিজের আত্মীয় স্বজনেরাও এই ঘটনার কথা জানতে পারবে না। এই বর্ণনা মালাধরে নেই। মালাধর এই অংশ অত্যন্ত সংক্ষেপে করেছেন।

এরপর মালাধর বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ, দধি দুগ্ধ ভক্ষণ, যমলার্জুন ভঙ্গ, কৃষ্ণের ফলক্রয় লীলা ও বাল্যক্রীড়া। অতঃপর গোকুলে অসুরদের ক্রমাগত অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নন্দের গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসতি স্থাপনের প্রসঙ্গ রয়েছে। মূল

ভাগবতে গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবনে যাবার উপদেশ উপনন্দ দিয়েছিলেন। ভাগবতের বর্ণনায় আছে— নন্দ যখন গোকুলে উৎপাতের কারণে সমস্ত গোপগণকে একত্রিত করেছিলেন মন্ত্রণা করার জন্য তখন সেখানে উপনন্দ নামে একজন বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বিশেষ অভিজ্ঞও ছিলেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম যেন সর্বদা সুখে থাকেন সেই বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন। তিনিই বলেছিলেন—ইদানীং তাদের এই বাসভূমিতে মাঝে মাঝেই অত্যন্ত ভয়ানক কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলি শিশু বালকদের পক্ষে বিশেষভাবেই ক্ষতিকর বলে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। সুতরাং গোকুল এবং গোকুলবাসীদের মঙ্গল যদি তাঁদের অভিপ্রেত হয়, তাহলে তাঁদের অন্যত্র গমন করাই উচিত হবে। ভাগবতের বর্ণনায় আছে—

"যাবদৌৎপাতিকোহরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।

তাবদ্ বালানুপাদায় যাস্যামোহন্যত্র সানুগাঃ।।

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।

গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্।।"[২০]

অর্থাৎ বড় কোনো মহা অনর্থ এসে এই ব্রজ ভূমিকে ধ্বংস করে দেবার আগেই সন্তানসন্ততি এবং অনুচরদের নিয়ে অন্য কোথাও তাঁদের চলে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু মালাধর স্বীয় কাব্যে সেখানে গোকুল ত্যাগের প্রসঙ্গ নন্দের উক্তি দিয়ে করেছেন।

মালাধর তাঁর কাব্যে গোপীপ্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গিয়েছেন। যেটুকু না বললে হয় না ঠিক ততটুকুই বলেছেন। ব্রজবাসীগণ যখন নানা উৎপাতে ভীত হয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে সঙ্গে করে ব্রজভূমি ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গমন করে তখন সঙ্গে গোপীরাও ছিল। ভাগবতে গোপীদের বর্ণনা—

"গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ।

কৃষ্ণলীলাং জগুঃ প্রীতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ।।"[২১]

অর্থাৎ গোপীগণ এই যাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ সাজসজ্জা করেছিলেন। তাঁরা বক্ষঃস্থলে নতুন কুঙ্কুমের পত্রলেখা অঙ্কিত করে রথে আরূঢ় হয়ে কৃষ্ণলীলা গান করতে করতে সেই যাত্রায় বিশেষ শোভার সংযোজন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু মালাধর এই জায়গায় লিখেছেন—

"ভাল ভাল বলিয়াত গোয়ালা বলিল।

ছাড়িয়া গোকুল বৃন্দাবনেরে চলিল।।

ঘরের জতেক সজ্জ একত্র করিয়া।

সকটে চলিলা সভে সিঙ্গা বাজাইয়া।।"[২২]

মালাধরের বর্ণনায় এখানে গোপীদের প্রসঙ্গ নেই। গোপীরা গোকুল ত্যাগের সময় যে সাজসজ্জা করেছিল তার বর্ণনাও মালাধরের কাব্যে নেই। শুধুমাত্র গোয়ালাদের প্রসঙ্গ রয়েছে এবং সকলে শিঙ্গা বাজিয়ে গমন করেছিল তা বলা আছে এই বর্ণনায়।

এইভাবেই কাহিনি পরম্পরা এগিয়ে যেতে থাকে। এরপরেই মালাধর ভাগবত অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন বৎসাসুর বধ, বকাসুর বধ, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মার মোহ এবং ভগবান কর্তৃক সেই মোহ নাশ, ধেনুকাসুর বধ ও তাল ভক্ষণ। অতঃপর কালীয় দমন কাহিনি। কৃষ্ণের বাৎসল্য লীলার অন্তর্ভুক্ত এই কাহিনিটি। তবে এই লীলাতে কৃষ্ণের বীরভাবের প্রকাশ ঘটেছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে না জানিয়ে স্বয়ং একাকী বালকদের নিয়ে গোচারণে বের হলেন। প্রচণ্ড দাবদাহে তৃষ্ণার্ত বালকগণ যমুনার একটি হ্রদে বিষাক্ত জলপান করে মৃত্যু মুখে পতিত হল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মায়া দৃষ্টিতে দেখলেন যমুনার জলে কালীয়নাগের অবস্থান। তিনি চিন্তা করলেন এই কালীয়কে অন্যত্র পাঠাতে পারলে বৃন্দাবনের লোকজন নিশ্চিন্তে জলপান করতে পারবে। তখন কৃষ্ণ সামনে থাকা এক সুউচ্চ কদম গাছে উঠে কালীদহের জলে ঝাঁপ দেয়। এই পর্যন্ত ভাগবতের বর্ণনার সাথে মালাধরের বর্ণনা এক। কিন্তু এরপরেই মালাধরের বর্ণনা পাল্টে যায়। মালাধর কাহিনিতে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে এখানে একটু নূতনত্ব এনেছেন। এখানে মালাধর বলেছেন— মানুষের শব্দ শুনে তখন অন্য সাপগণ কৃষ্ণকে বেষ্টন করল। তারা কৃষ্ণকে দংশন করতে গিয়ে ব্যর্থ হল এবং ভয়ার্ত চিত্তে তারা কালীয়নাগের কাছে অভিযোগ করল। মালাধরের বর্ণনা—

"সুন সুন নাগরাজ অদ্ভুত কথা।

এক গোটা মানুষে কৈল পঞ্চলি অবস্থা।।

তাহাসনে আমরা বিস্তর কৈল রন।

মস্তক ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল দসন।।

লঙ্ঘিল তোমার পুরি পাইল তরাসে।

পালাইয়া আইলা তোমার পাসে।।"[২৩]

কিন্তু ভাগবতের বর্ণনায় দেখি— শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার জলে ঝাঁপ দেয় তখন সেই হ্রদের জল ভীষণভাবে উদ্বেলিত হল। মত্ত গজরাজের মত প্রবল বিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদে উদ্দাম জলক্রীড়া করলে তাঁর বাহু ও পায়ের আঘাতে জলে তোলপাড় হয়ে প্রবল শব্দের সৃষ্টি হল। সেই শব্দ শুনে এবং নিজের বাসস্থান লণ্ডভণ্ড হচ্ছে দেখে কালীয় নিজেই বেড়িয়ে এল এবং শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। তখন সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বালক কৃষ্ণকে দংশন করতে উদ্যত হল এবং নিজের শরীর দিয়ে তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। নাগপাশে বদ্ধ অবস্থায় তাঁকে কোনোরকম নড়াচড়া করতে না দেখে তাঁর প্রিয় সখা গোপবালকেরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। দুঃখে, আশঙ্কায়, ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে তারা মূর্ছিতের মত ভূমিশয্যা নিল। মালাধরের বর্ণনা এখানে ভাগবত বহির্ভূত। মালাধরের বর্ণনায় দেখি—

"কালিদহে ঝাঁপ দিল কানাঞী দেখিল।

ধাঞা ছাওআল সব গোকুলে জানাইল।।"[২৪]

গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়িতে খবর দেবার প্রসঙ্গ ভাগবতে নেই। ভাগবতের বর্ণনায় দেখা যায় সেই সময় গোকুলে অমঙ্গলসূচক ভয়ংকর উৎপাত শুরু হয় এবং এইসব দুর্লক্ষণ থেকে তাঁরা ধরে নেন যে কৃষ্ণের কোনো বিপদ হয়েছে। তখন শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কায় তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের খোঁজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথের মধ্যে গোপবালকদের পদচিহ্নের সঙ্গে বিশেষ চিহ্নসূচক কিছু পদচিহ্ন দেখে তারা যমুনাতটের দিকে চলতে লাগলেন। দূর থেকে গোপেরা দেখতে পেলেন যমুনার হ্রদের মধ্যে কালীয় দ্বারা বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন। গোপবালকেরাও অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। ভাগবতের বর্ণনায় এখানে রোহিণীর প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু মালাধর এখানে রোহিণীর প্রসঙ্গও এনেছেন—

"ধাইয়া জসোদা জায় বুকে ঘাউ হানি।

তার পাছু কান্দিয়া চলিলা রোহিণী।।"[২৫]

মালাধর ভাগবত অনুসারে কালীয়দমন কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তবে এই কাহিনিতে তিনি ভাগবতের একটি প্রসঙ্গকে এড়িয়ে গিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গটি গোপীদের। কালীহ্রদের তীরে নন্দ যশোদার সঙ্গে গোপীদের উল্লেখ ভাগবতে আছে। কৃষ্ণের জন্য গোপীরাও বিলাপ করেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপীদের কথা নেই। মালাধরের বর্ণনায় আর

একটি নতুন বিষয় ঠাঁই পেয়েছে। সেটি হল মাতৃ হৃদয়ের আকূতি। যে বর্ণনা ভাগবতে নেই। প্রথমেই বলেছি গুণরাজ খান শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে বাঙালি গৃহের উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন। মালাধর এখানে যে জসোদাকে অঙ্কিত করেছেন সে যেন বাঙালি ঘরের চিরন্তন মায়ের চিত্র, যে মাকে আমরা প্রতি মুহূর্তেই আমাদের আসে পাশে প্রত্যক্ষ করি। বাৎসল্য রসের বর্ণনায় এখানে মালাধরের কবিত্ব স্বীকার করতেই হয়। এখানে মাতৃ-হৃদয়ের দীর্ঘ আকূতি আছে। একটু উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে—

"এ পাপ জমুনা কুলে দুঃসহ কালির জলে
কেমতে সহিবে বিস জাল।
দুকুলে জতেক বৈসে মরিল নাগের স্বাসে
উঠপুত্র আবাল গোপাল।।
কালির উপর দিয়া না জায় পক্ষ উড়িয়া
চন্দ্র সূর্য্য না করে গমন।
কার বোলে এথা আসি ঝাঁপ দিলে জলে পসি
উঠ পুত্র কমল লোচন।।"[২৬]

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসার এই নিদর্শন আমরা বাংলা সাহিত্যে আগমনি বিজয়া গানেও প্রাপ্ত হই। দুপুরের তপ্ত রোদে তৃষ্ণার্ত শিশু কৃষ্ণকে দুগ্ধ পান করানোর জন্য জননীর হাহাকার 'স্তন পিয় বসিয়া মাএর কোলে'-- এ বর্ণনা তো কোনো বাঙালি কবির পক্ষেই সম্ভব। মাত্র সাত বৎসর বয়েসে কালিদহে কৃষ্ণের আগমন এবং মৃত্যুর কথাও মালাধরে প্রাপ্ত হই আমরা, যা মূল ভাগবতে নেই। মূল ভাগবতে দেখি যখন সব গোপগণকে ক্রন্দনরত অবস্থায় কৃষ্ণ দেখলেন তখন তিনি মায়ারূপ ত্যাগ করে স্বমহিমায় ফিরে এলেন। কিন্তু মালাধরের বর্ণনায় বলরাম কৃষ্ণকে মায়া ত্যাগ করে ফিরে আসতে বলেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায় ভগবান কর্তৃক দাবাগ্নি ভক্ষণ অবলম্বনে মালাধর স্বীয় কাব্যে 'দাবাগ্নি ভক্ষণ' লিখেছেন। এই কাহিনি অবলম্বনে ভাগবতে একটি পুরো অধ্যায় আছে কিন্তু মালাধর মাত্র বারো ছত্রে তা সম্পূর্ণ করেছেন। ভাগবতের অষ্টাদশ অধ্যায় প্রলম্বাসুর উদ্ধার। মালাধরেও এ কাহিনি রয়েছে। ভাগবতের কাহিনিতে আছে—

প্রলম্বাসুর শিশুরূপ ধারণ করে সব গোপবালকদের সঙ্গে মিশে খেলার ছলে কৃষ্ণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। খেলায় ঠিক হয় যে একজন আর একজনকে কাঁধে করে নিয়ে ভান্ডিরক নামে একটি জায়গা পার করবে। এই রকম করে খেলার ছলে অসুরের কাঁধে বলরাম চাপে। কিন্তু যতদূর নিয়ে গিয়ে তাঁকে অপসারণ করার কথা তা না করে অসুর নিজের রূপ ধারণ করে। তখন বলরাম নিজের দেহভার কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে। প্রলম্বাসুর বলভদ্রের ভার বইতে না পেরে তাঁর ভারে ভূমিতে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মালাধরের বর্ণনায় একটু অন্য রকম দেখা যায়। প্রলম্বাসুর যখন বলরামকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কৃষ্ণ বলরামকে বলে—

"কানাঞি বলেন বলাই ভাই হেলা কেন কর।

আপনার মুর্ত্তি ধরি অসুর সংহার।।"[২৭]

কাহিনি গ্রন্থনে মালাধরের অপূর্ব যুক্তি পরম্পরা, দেশ জাতির রীতি-সংস্কার, আদর্শ ঐতিহ্য মেনে কাহিনি বয়ন নিঃসন্দেহে কবির কবিত্ব-নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। সেই সময়ে সমাজে যে ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠা কমে আসছিল, তাঁদের জ্ঞানের পরিধি যে সীমিত হয়ে আসছিল তা মালাধরের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার। তিনি লিখেছেন—

"হরি সেবি লোক জেন চেতন পাইল।।

দুই দিকে বন বাড়ি পথ আৎসা দিল।

বেদ না জানিঞা জেন দিজ নষ্ট হৈল।।"[২৮]

এই বর্ণনা ভাগবতে নেই। এটি মালাধরের নিজস্ব সৃষ্টি। আসলে যুগ সচেতন কবি যুগের বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তাই যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই তিনি স্বীয় কাব্যে তা প্রকাশ করেছেন অবলীলায়।

ভাগবতের বিংশ অধ্যায় জুড়ে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা রয়েছে। মালাধরের কাব্যে খুব সংক্ষেপে হলেও বর্ষা বর্ণনার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বর্ষায় যে কৃষকেরা তাঁদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে কথাও মালাধরের দৃষ্টি এড়ায়নি। মাত্র বারোটি পংক্তিতে মালাধর সে কথা বলেছেন। যদিও ভাগবতে সে বর্ণনা অনেকটা অংশ জুড়েই আছে। ভাগবতে প্রকৃতি মাতার বর্ণনায় ব্যাসদেব কোনো কার্পণ্য রাখেন নি। সেই বর্ণনায় দেখা যায়, মেঘগর্জন,

প্রবল বায়ু বিক্ষোভ। বর্ষার জলে সমস্ত শুষ্কপ্রায় নদী জলে পুষ্ট হয়ে উঠেছে, শস্যক্ষেত্রগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ফসলে। মালাধরের বর্ণনা—

"হেন মতে খেলাএ বরিসা সমএ।
হরসিত সর্ব্বলোক সরত উদএ।।
আকাসে নির্ম্মল পথ পঙ্ক ঘুচিল।
হরি সেবি মন জেন নির্ম্মল হইল।
.....
দৃঢ় করি সেতু বান্ধে কৃসকে রাখে পানি।
গোবিন্দ বেরিয়া জোগি রাখএ পরানি।।"[২৯]

এ বর্ণনা তো দেশ-কাল রহিত সমস্ত কৃষক কুলের। যারা বর্ষার ওই কয়েকটি দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

ভাগবতের একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত ও গোপীপ্রসঙ্গ আছে। আমরা জানি মালাধর মূলত ঐশ্বর্য ভাবের কবি, মাধুর্য ভাব তাঁর কাব্যে খুব কম পাওয়া যায়। আর যেখানে গোপী প্রসঙ্গ আছে সেখানে মাধুর্য ভাবের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক, তাই মালাধর গোপী প্রসঙ্গ যতটা পেরেছেন অতিক্রম করে গিয়েছেন। ভাগবতে এই অধ্যায়ে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন মহিমা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত থেকেছে। একজন গোপী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং নিজেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করে সেইসব প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করেছেন। কিন্তু মালাধর সেই প্রসঙ্গ মাত্র দশটি পংক্তিতে করলেও বিষয়গত সব কিছুই ঠিকঠাক বলেছেন।

ভাগবতের ২২তম অধ্যায়ে ভগবানের বস্ত্রহরণ লীলা বর্ণিত। এই কাহিনির শুরুতে ভাগবতে কাত্যায়নী ব্রতের কথা রয়েছে। মালাধর এই কাহিনি মোটামুটি একই রেখেছেন, তবে কাহিনির শুরুতে ভাগবতে ব্রতের যে নাম বলা আছে, মালাধর তা রাখেন নি। ভাগবতে আছে--

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্।।"[৩০]

অর্থাৎ হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দ ব্রজের কুমারীগণ দেবী কাত্যায়নীর পূজা তথা ব্রত আচরণে প্রবৃত্ত হলেন। আর মালাধর বলেছেন—

"সরত নিবড়িল হেমন্ত উদয়ে।
বৃজকন্যা সব ব্রত করিতে চলএ।।
জমুনার কুলে বস্ত্র অলঙ্কার এড়ি।
বিবস্ত্রে স্নান করি পুজে দেবি চণ্ডি।।"[৩১]

গোপীরা যমুনার কুলে বস্ত্র অলঙ্কার ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে পাবার জন্য দেবী চণ্ডীর পূজা করেছিল একথা আমরা মালাধরের কাব্য থেকে প্রাপ্ত হই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন বস্ত্রহরণ কাণ্ডে মালাধর কিছুটা হলেও কামুক কৃষ্ণের কথা বলেছেন। যে প্রসঙ্গ ভাগবতে নেই। আসলে মালাধর যুগের প্রয়োজনে যুগ বৈশিষ্টকে নিয়েই এই কাব্য রচনা করেছেন। তাতে যে লৌকিক কিছু কিছু কথা মিশ্রিত হয়েছে এই বর্ণনা কিছুটা তার সাক্ষ্য বহন করে। মালাধরের বর্ণনাটি এরূপ —

"দর্প করি জত বোল বলিলে আমারে।
কর জোড় করি দোস ক্ষমহোঁ তোমারে।।
কৃষ্ণের বচন দড় সুণিঞা জুবতি।
জোড় হাত করি সভে করিল প্রণতি।।
দেখিয়া সভার অঙ্গ হাসে গোবিন্দাই।
কৌতুক পাইয়া কৃষ্ণ সভাপানে চাই।।
দেখিয়া সভার অঙ্গ আনন্দ হৈল।
হাথে হাথে একে একে সভার বস্ত্র দিল।।"[৩২]

এরপর মালাধর একে একে বর্ণনা করেছেন-- বিপ্রপত্নীগণের নিকট কৃষ্ণের অন্ন প্রার্থনা, ইন্দ্র পূজা নাশ ও গোবর্দ্ধন ধারণ, বরুণলোক থেকে নন্দের উদ্ধার। শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক তিনি মাত্র কয়েকটি ছত্রে করেছেন। এরপরেই ভাগবতের রাসলীলা অবলম্বন করে মালাধর স্বীয় কাব্যে কৃষ্ণের রাস বর্ণনা করেছেন। ভাগবতে রাস প্রসঙ্গে কোথাও

রাধার নাম নেই। মালাধর বসুও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কোথাও রাধার নাম করেন নি। তার পরিবর্তে 'এক নারি' শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়— 'এক নারি লৈয়া কৃষ্ণ করিলা গমন।' দেখা যায় রাসলীলা প্রসঙ্গে মালাধর কৃষ্ণের বংশীধ্বনির কথা উল্লেখ করেছেন। ভাগবতে এমন সুন্দর ভাবে বংশীর কথা কোথাও নেই। মালাধর তাঁর কাব্যে ভাগবত বহির্ভূত বিষয় বর্ণনাতেও কৃষ্ণের ভগবৎ সত্তার প্রকাশ দেখিয়েছেন। রাসলীলার শেষেও মালাধর যেভাবে পাঠককে উপদেশ কথা শুনিয়েছেন তার মধ্যে ভক্ত স্বরূপটি ফুটে উঠতে দেখা যায়—

"সংসারের সার গোসাঞি সব জির্ন্ন জাএ।
অন্য জন হৈলে তারে নরক ভূঞ্জাএ।।
বিস হেন বিসম বস্তু মহাদেব খাএ।
আর জন হইলে মৃর্ত্তু ততক্ষনে পাএ।।
সংসারিকা লোক না করিহ পরদার।
পরদার অধিক পাপ না জানিহ আর।।
চৌরাসি নরক কুণ্ড জত জমলোকে।
পরদার করিলে তা ভূঞ্জয়ে একে একে।।
না করিহ পরদার সুন সর্ব্বজনে।
পরনারি পরসনে নরকে গমনে।।
রাস কৃড়া কৈল কৃষ্ণ সুন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে।।"[৩৩]

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৩৭তম অধ্যায়ের কেশী ও ব্যোমাসুর উদ্ধার এবং ৩৮তম অধ্যায়ের অক্রুরের ব্রজযাত্রা অবলম্বনে মালাধর তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেছেন। এরপরের কাহিনিতে রজকের নিকট বস্ত্রপ্রার্থনা, মালাকারের প্রতি কৃপা, কুব্জার প্রতি কৃপা, কৃষ্ণ কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ, কুবলয় হস্তী বধ, কৃষ্ণের মল্ল যুদ্ধ, চানূর ও মুষ্টিক বধ এবং অবশেষে কংসাসুর বধের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কংসের মৃত্যুর পর শ্রীকৃষ্ণ কংসের মহিষীগণকে প্রবোধ দান করেন এবং মৃতদেহ সংস্কার ও পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে পিতা-

মাতাকে কারাগার থেকে মুক্তি দান করেন। মালাধরের বর্ণনায় এরপর দেখা যায়, উগ্রসেনকে রাজ্যভার প্রদান করে কৃষ্ণ ও বলরামের সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেন।

ভাগবতের নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বলরামের বিবাহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অবশ্য দশম স্কন্ধের ৫২তম অধ্যায়েও। কিন্তু মালাধরের গ্রন্থে যেভাবে বলরামের বিবাহের চিত্র দেখা যায়, তার সঙ্গে ভাগবতের মিল নেই। মালাধরের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং শেষাংশ অভিনব। মালাধরের বর্ণনায় দেখা যায়—

"নানাবাদ্য নিত্যগিত হর্স সর্ব্বক্ষনে।
বিভা কৈল বলভদ্র কন্যা শুভক্ষনে।।
আতি দির্ঘ্য কন্যা অতি রূপবতি।
তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি।।
বলভদ্র কন্যা দেখি লাঙ্গল আনিল।
লাঙ্গল আনি রেবতির কান্দে ঠেকাইল।।
ইসত লিলাএ বলাই লাঙ্গল চাপিল।
ঘুচাইল দির্ঘ্য তনু প্রমান রাখিল।।
একেত সুন্দরি কন্যা দিগুন হৈল রূপ।
দেখিয়া সকল লোক পাইল অদ্ভুত।।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি কন্যা কী কহিব কথা।
সংসারে উপমা নাঞি গোসাঞির বনিতা।।
বিভা করি বলরাম গেলা বাসঘর।
গুণরাজ খাঁন বলে বিভা হলধর।।"[৩৪]

ভাগবতে বা অন্যান্য পুরাণে বলরামের বিবাহ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত কথাগুলি নেই। আমাদের মনে হয় এই রকম কৌতুককর কাহিনি মালাধর নিজস্ব ভাবনা থেকেই সৃজন করেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনাকালে মালাধরের লক্ষ্য ছিল মূলত প্রাকৃতজন অর্থাৎ সামাজিক সাধারণ মানুষ। তাই ভাগবতের বিষয়কে জনরুচির উপযোগী করে তিনি পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভক্তির প্রতি নিষ্ঠা তাঁর বিন্দু মাত্র কমেনি। মনে হয় সে কারণেই ভাগবতের দুরূহ বিষয় বর্ণনার মাঝে মাঝে তিনি সহজ সরল রস মিশিয়ে দিয়েছেন। স্যমন্তক মনি উদ্ধারের ঘটনায় এর একটি প্রমাণ মেলে। দেখা যায়, স্যমন্তক মনির জন্য বলরাম ও কৃষ্ণ শতধন্বাকে নিহত করলেন। এরপর দুই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হলে বলরাম মিথিলা চলে গেলেন, কৃষ্ণ সত্যভামার কাছে ফিরে এল। সত্যভামা দেখলেন কৃষ্ণের হাতে মনি নেই। এই অংশে কৃষ্ণ-সত্যভামার কথোপকথন অধিকাংশই কবির নিজস্ব সংযোজনা—

"লজ্জা পাইয়া গদাধর আসি নিজ পুরি।
সত্যভামাকে কৃষ্ণ বলেন পরিহরি।।
সুন প্রীয়ে সত্যভামা বলিএ তোমারে।
সতধর্ম্বায় মারিয়া মনি করিল বিচারে।।
না পাইল মনি প্রিয়া বলিল তোমারে।
বুঝিয়া হৃদয়ে কোপ না করিহ মোরে।।
সুনিঞা কান্দএ সতি ছাড়িয়া নিস্বাস।
রুক্মিরে দিলে মনি আমায় করিয়া নৈরাস।।
ভাল হৈল সুখে থাক লইয়া সেই নারি।
চলিলা বাপের বাড়ি ক্রোধ মনে করি।।"[৩৫]

এ বর্ণনা তো প্রতিটি বাঙালি ঘরের নিজস্ব ঘরকন্নার বর্ণনা। এই বর্ণনা ভাগবতের বর্ণনা নয়। আসলে মালাধর ভাগবতের অনুবাদ করবেন বলে মনঃস্থির করলেও কাহিনি বয়নসূত্রে তিনি যুগ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি।

স্যমন্তক মণি উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পাতালে প্রবেশ করলে বারদিন অপেক্ষা করে দ্বারকাবাসী শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোক করতে লাগলেন। তখন তারা কৃষ্ণকে ফিরে পাবার

আশায় দেবী দূর্গার পূজা করলেন। এই কথা ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৫৬ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে আছে—

"সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।

উপতস্থুর্মহামায়াং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে।।"[৩৬]

অর্থাৎ শোকাকুল দ্বারকাবাসী সকল ঘটনার জন্য সত্রাজিৎকে দায়ী করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে পাবার আশায় তারা মহামায়া শ্রীদূর্গাদেবীর শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মালাধর লিখেছেন যে, দেবকী পুত্রকে মৃত ভেবে শোক করলে রুক্মিণীর বাম উরুতে স্পন্দন হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন,--

"নাহি মরে তোমার পুত্র লয় মোর মনে।"[৩৭]

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঊনষাটতম অধ্যায়ে ৩৮-৪০ ছত্রে পারিজাত হরণের উল্লেখ আছে। কাহিনি বলতে সেখানে কিছুই নেই। তাই পারিজাত হরণ কাহিনিটি ভাগবত বহির্ভূত বললে হয়তো অনেকের ঠিক মনে হবে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে এই দুটি গ্রন্থের কাহিনি তুলনা করে দেখলেই বোঝা যায় যে, ভাগবতে মাত্র কয়েকটি শ্লোকে পারিজাত হরণ কাহিনি বলা আছে। কিন্তু মালাধর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একে একটি সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ কাহিনির রূপ দিয়েছেন।

ভাগবতে পারিজাত হরণ কাহিনি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। মালাধর এই কাহিনি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা দেখে মনে হয় না যে, এই কাহিনির উৎস ভাগবত। মালাধর এই কাহিনি কোথা থেকে চয়ন করেছেন বলেন নি। কিন্তু মাধব আচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের একটি জায়গায় দেখা যায় তিনি লিখেছেন—

"পারিজাত হরণ ঈষত ভাগবতে।

বিস্তারি কহিব বিষ্ণু পুরাণের মতে।।"[৩৮]

কবির উক্তিতেই কাহিনিটির উৎস খুঁজে পেতে আমাদের অসুবিধে হয় না। 'বিষ্ণুপুরাণ' ব্যতীত 'হরিবংশ'-এ পারিজাত হরণ কাহিনি বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়। মালাধর তাঁর কাব্যে যে ভাবে কাহিনি বর্ণনা করেছেন তার থেকেও বিস্তৃত হরিবংশের কাহিনি। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে পারিজাত হরণ কাহিনিটি মোট নয়টি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, মালাধর তাঁর গ্রন্থে নয়টি অধ্যায় অনুসরণ করেন নি। আনুষঙ্গিক দুই-একটি

ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে কৃষ্ণ-ইন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনাই তিনি মুখ্য করেছেন তাঁর কাব্যে। বিষ্ণুপুরাণের কাহিনির সঙ্গে মালাধরের বর্ণনা অংশের যতটা না মিল আছে, ঠিক ততটাই মিল আছে হরিবংশের কাহিনির সঙ্গে। হরিবংশে পারিজাত হরণ কাহিনিতে নারদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কৃষ্ণ নারদের সম্মুখেই পারিজাত হরণের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কৃষ্ণের আদেশ শিরোধার্য করেই নারদ দূত হিসেবে ইন্দ্রের কাছে গিয়েছেন এবং নারদের মুখে ইন্দ্রের যুদ্ধের অভিপ্রায় শুনেই কৃষ্ণ যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছেন। মালাধরের বর্ণনাও অনেকটা এই রকম। তাই আমাদের অনুমান মালাধর বিষ্ণুপুরাণ নয়, হরিবংশের পারিজাত হরণ কাহিনি থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্যতম একটি ঘটনা জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত। এই ঘটনাটি মালাধরে যে ভাবে পাওয়া যায় মূল ভাগবতে সে ভাবে নেই। আবার হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণেও জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত নেই। তাহলে মালাধর এই কাহিনি কোথা থেকে গ্রহণ করলেন ? ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২২তম অধ্যায়ে জরাসন্ধের প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখানে জরাসন্ধের জন্ম প্রসঙ্গে দু'একটি কথা আছে। মালাধরে যে ভাবে এই কাহিনির বর্ণনা আছে তা দেখে মনে হয়, মালাধরের কাহিনির উৎস অন্য কোথাও। কিন্তু কোথায় ? দেখা যায় যে, মহাভারতের সভাপর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত আছে। আমাদের অনুমান মালাধর 'মহাভারত' থেকেই এই কাহিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে, মালাধরের কাহিনি ও মহাভারতের কাহিনির মধ্যে একটু অদল-বদল আছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হে কৃষ্ণ, জরাসন্ধ কে ?' কিন্তু মালাধর লিখেছেন—

"ভিম বলে জরাসিন্ধু নাম কেন তারে।"[৩৯]

মহাভারতে আর একটি জায়গায় দেখা যায়, ঋষিমুনি চন্ডকৌশিক জরাসন্ধের পিতা মহারাজ বৃহদ্রথের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুত্রবর দান করেছিলেন। কিন্তু মালাধর এক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

"আচম্বিতে দুর্বাসামুনি আসি তার ঘরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পুজা করিল সত্বরে।।
তুষ্ট হৈয়া বলে মুনি রাজা মাগ বর।"[৪০]

এরপরেই রাজা দুহাত জোড় করে বর প্রার্থনা করেছিলেন। মহাভারতে রয়েছে মুনিঋষি চন্ডকৌশিক রাজা বৃহদ্রথকে পুত্রবর দিয়েছিলেন। কিন্তু মালাধরের কাব্যে পুত্রবর দিয়েছিলেন মুনি দুর্বাসা। এই রকম একটু গরমিল ছাড়া বাকি কাহিনি প্রায় একরকম।

ভাগবতের কাহিনিতে দেখা যায়, কালযবন বধের পর জরাসন্ধ পুনরায় মথুরাপুরী আক্রমণ করেছেন। কিন্তু মালাধর কাহিনিতে নতুনত্ব আনবার জন্য কালযবন প্রসঙ্গ পরে রেখেছেন।

বজ্রনাভ উপাখ্যান কৃষ্ণের দ্বারকালীলার অন্তর্গত। ভাগবতে এই কাহিনিটি নেই। কিন্তু এই কাহিনিটি মালাধরের গ্রন্থে আছে বেশ বিস্তৃত ভাবে। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব অংশে বজ্রনাভ উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটি বিষ্ণুপর্বের ৯১ তম অধ্যায়ে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ৯৭ তম অধ্যায়ে। হরিবংশে এই উপাখ্যানটি বেশ দীর্ঘ। আমাদের অনুমান মালাধর এই কাহিনিটি হরিবংশ থেকেই গ্রহণ করেছেন। মালাধরের বজ্রনাভ উপাখ্যানের সাথে হরিবংশের কাহিনির মিল অনেকটাই।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এ রামায়ণ অভিনয়ের একটি প্রসঙ্গ রয়েছে। মূল ভাগবতের নবম স্কন্ধে দেখা যায় রামকথা আছে, কিন্তু রামায়ণ অভিনয়ের ঘটনা নেই। ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধেও রামায়ণ অভিনয়ের কোনো কথা নেই। তাহলে মালাধর রামায়ণ অভিনয়ের বর্ণনা দিলেন কোথা থেকে? জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রাপ্ত রামকথা ব্যতীত মালাধরের নামে একটি ছোট 'রামায়ণ' পুথিও আছে। এই রামায়ণ পুথি থেকেই মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রামায়ণ অভিনয়ের কাহিনি গ্রহণ করে থাকতে পারেন। ভাগবতে কৃষ্ণের দ্বারকালীলায় বজ্রনাভ উপাখ্যান অনুপস্থিত। এই রামায়ণ অভিনয় বজ্রনাভ উপাখ্যানেরই একটি অংশ।

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সুভদ্রা হরণের কাহিনি রয়েছে। আমাদের অনুমান মহাভারত থেকে সুভদ্রা হরণের কাহিনি গ্রহণ করেছেন তিনি।

মালাধর উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন—

"ভক্তবৎসল গোসাঞি দেব নারায়ন।
উদ্ধবেরে বিস্বরূপ দেখায় তখন।।
কোটি কোটি সূর্য্যের প্রকাস তেজোর্ম্মএ।

স্বর্গলোক মস্তকে পৃথুবি মধ্যকাএ।।"[৪১]

উদ্ধবকে বিশ্বমূর্তি প্রদর্শন অংশটি ভাগবতে নেই; বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশেও নেই। ভাগবতে 'শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ' নামে একটি অধ্যায় আছে। সেখানে নানা তত্ত্বকথা আছে। কিন্তু উদ্ধব কর্তৃক ভগবানের বিশ্বমূর্তি দর্শনের কথা নেই। তবে ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের অন্তর্গত ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান কর্তৃক 'মহাবিভূতি কথন' নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদে উদ্ধব প্রশ্ন করেছেন যে, হে মহাবিভূতে ! স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এবং দিগদিগন্তে আপনার যে সকল বিভূতি আছে, সেই সকল আমার কাছে ব্যক্ত করুণ, আমি আপনার পায়ে প্রণতি করি। এরপর কৃষ্ণ উদ্ধবকে আপন বিভূতির স্বরূপ শুনিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শন করান নি। বিশ্বরূপ দর্শনের বিষয়টি 'গীতা'র একাদশ অধ্যায়ে রয়েছে। এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে। সেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমে ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়েছিল। পরে সেই ভয়ঙ্কর রূপে বিস্মিত ও ভীত হয়ে অর্জুন কৃষ্ণকে সৌম্যমূর্তি ধারণের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীমদ্ভগবত গীতায় আছে—

"হৃষ্ট আমি দেখি অদৃষ্ট স্বরূপ
ভয়েতে ব্যথিত মানস আমার,
দেখাও আমাকে তব দেব-রূপ
দেবেশ! প্রসন্ন হও বিশ্বাধার !
কিরীটি ভূষিত, গদাচক্রধারী
ইচ্ছা মম দেখি তব সেই রূপ,
ধর চতুর্ভুজ পূর্ব্বরূপ তব
হে সহস্রবাহো! ওহে বিশ্বরূপ !"[৪২]

এই কাহিনির সাথে উদ্ধব কর্তৃক প্রথমে কৃষ্ণের ভয়ঙ্কর মূর্তি ও পরে সৌম্যমূর্তি দর্শনের মিল লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা গীতার নিষ্কাম ধর্মের উপদেশ।

ভাগবতে আছে দেবী রতি সম্বরের গৃহে পাচিকা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে রতি যে মায়ানারী সৃজনের কথা প্রদ্যুম্নকে বলেছে তা মালাধরের নিজস্ব কল্পনা।

ইন্দ্রের গৃহে পাণ্ডুর দর্শন, শিশুপালের জন্মকাহিনি আমাদের অনুমান অনুসারে মহাভারতের সভাপর্ব থেকে গৃহিত হয়েছে।

কৃষ্ণকথা নিয়ে রচিত এই কাব্যে শাক্তপ্রভাবের অনেক নিদর্শন রয়েছে। স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনায় রুক্মিণী দেবকীকে বলেছেন—

"উঠ উঠ পুজ দেবি চণ্ডিকা ভবানী।"[৪৩]

আবার নরকাসুর এর সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণনায় দেখি—

"উথা বন্দি ঘরে জত রাজার কুমারি।

ঘট পাতি পুজে তারা দেবি মাহেস্বরি।।"[৪৪]

ভাগবতে এই যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে শক্তিপুজার কোনো উল্লেখ নেই। ঘট পেতে দেবী মাহেশ্বরীর এই পূজা প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডীর পূজার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভাগবতে আছে কিন্তু মালাধরের কাব্যে অনুপস্থিত

মালাধরের লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্য সত্ত্বাকেই প্রকাশ করা। আর এই বীররস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে শুধু সংক্ষেপকরণ নয়, নিজের কাব্যের কাহিনিকে সংহত রূপ দেবার প্রয়োজনে কোথাও কোথাও মালাধর দশম স্কন্ধের পুরো অধ্যায় পরিত্যাগ করেছেন।

১. ভাগবতের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিষয়ে নন্দরাজের সঙ্গে গোপগণের আলোচনা নামে একটি অধ্যায় আছে। মালাধরের কাব্যে এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

২. মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতের চৌত্রিশ অধ্যায়ের শঙ্খচূড় বধ ও তার পরেই ছত্রিশ অধ্যায়ের অরিষ্টাসুর বধের কাহিনি সংগৃহিত হয়েছে। কিন্তু মধ্যবর্তী পয়ত্রিশ অধ্যায়ের অন্তর্গত ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলাগীত সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য, অধ্যায়টি বৃন্দাবনলীলার অন্তর্গত। মালাধরের লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণের বীরলীলা অর্থাৎ ঐশ্বর্যলীলা; আর অসুর নিধন ঐশ্বর্যলীলার অংশ তাই মালাধর শঙ্খচূড় বধ এবং অরিষ্টাসুর বধ কাহিনি গ্রহণ করেছেন। গোপীদের গীত অংশটি তাঁর মনোপূত মনে হয়নি। মধুর রস

মালাধরের কাব্যে প্রধান নয়। তাই যেখানে মধুর রস পরিবেশনের সুযোগ ঘটেছে মালাধর সেখানে নিজেকে সংযত রেখেছেন।

৩. ভাগবতে দ্বারকালীলায় উল্লেখ্যযোগ্য 'শ্রুতিগণের স্তুতি'। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই অংশটি নেই।

ভাগবতে আছে সংক্ষেপে কিন্তু মালাধর বিস্তার ঘটিয়েছেন

ভাগবতে যে সব কাহিনি অংশ সংক্ষেপে আছে মালাধর সে সব কাহিনির কিছু বিস্তার ঘটিয়ে ঘটনাটিকে পাঠকের কাছে আরও সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ভাগবতে যে সমস্ত কাহিনি সংক্ষেপে রয়েছে কিন্তু মালাধর সেগুলি বিস্তৃত আকারে রচনা করেছেন তার একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হল--

১. শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। সেটি হল কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশে কবির উৎসাহ। ভগবানের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশে কবি এতটাই উৎসাহী ছিলেন যে, ভাগবতে বর্ণিত অনেক সংক্ষিপ্ত কাহিনিকেও তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের আঠাশতম অধ্যায়ের করুণ কাহিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত। কিন্তু কবি সেই কাহিনিকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

২. স্যমন্তক মণি উদ্ধারের ঘটনা ভাগবতে রয়েছে। মালাধর সেই কাহিনিতে নিজস্ব কল্পনা জুড়ে কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন।

৩. ভাগবতে বলরাম-রেবতীর বিবাহ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু মালাধর সেই কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪. ভাগবতে পারিজাত হরণের কাহিনি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু মালাধর সেই কাহিনিকে অনেকটাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫. ভাগবতের দশম স্কন্ধের আঠাশতম অধ্যায়ে বরুণ দেবের মুখে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণের মহিমার প্রকাশ ঘটেছে। এই কাহিনিতে মালাধরের হাতে বরুণ দেবের মুখের সংলাপ ব্যাবহার চরিত্রটিকে আরও জীবন্ত এবং কাহিনিটিকে অধিক বাস্তবানুগ করে তুলেছে।

ভাগবতে বিস্তৃত আকারে রয়েছে কিন্তু মালাধরে সংক্ষেপিত

১. মালাধরের কাব্যে বাৎসল্য রসের বর্ণনা তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। ভাগবতের তুলনায় সেটি নিতান্তই অনুজ্জ্বল। ভাগবতের রজ্জুবন্ধনলীলায় শিশু কৃষ্ণের মনোরম স্বভাববৈশিষ্ট্যের সাথে যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তা অনুপস্থিত।

২. ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ-বলরাম ও গোপসখাদের বাল্যলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। কেবলমাত্র গোচারণলীলাই দুটি অধ্যায় জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' কৃষ্ণ-বলরামের শৈশবলীলা অনুপস্থিত এবং গোচারণলীলা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে।

৩. ভাগবতের কৃষ্ণ-বিপ্রনারী সংবাদ অংশ অনেকটাই বিস্তৃত কিন্তু মালাধর সেটি সংক্ষেপে করেছেন। আসলে মধুর রসের পরকীয়া ঈশ্বর প্রেমের প্রতি কবির অনীহা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীদের ক্রন্দন ভাগবতে বিস্তৃত আকারে বর্ণিত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।

৫. শাল্ব বধের বিবরণ ভাগবতে খুব বিস্তৃত। কিন্তু মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বর্ণনা সংক্ষেপে করেছেন।

৬. কৃষ্ণের আবির্ভাবের পর বসুদেব ও দেবকী কর্তৃক দীর্ঘ বন্দনা আছে ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বন্দনা অতিশয় সামান্য।

৭. ভগবানের জন্মের পরে গোকুল নগরে নানা রকম উৎসব করা হয়। এই প্রসঙ্গ ভাগবতে যেমন আছে মালাধর ও তাঁর কাব্যে রেখেছেন। ভাগবতে এই উৎসব উপলক্ষে গোপরমণীগণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু মালাধর তাঁর কাব্যের মূল কাহিনির পক্ষে গোপরমণীগণের এই বর্ণনা অত্যাবশ্যক বিবেচনা না করে যথার্থ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মাত্র চারটি পঙক্তিতে মালাধর এই কাহিনি ব্যক্ত করেছেন—

"পুত্রোৎসব করি নন্দ ব্রাহ্মনকে আনি।
কুড়ি সহস্র গাবি দিল কনক সালিনি।।
স্ত্রিপুরূসে সর্ব্ব লোকে মোহৎসব করি।
সর্ব্বধনে সম্পূর্ন্ন হৈল নন্দের নগরি।।"[৪৫]

৮. ভাগবতের দশম স্কন্ধের মোট আট অধ্যায় জুড়ে গোপী প্রসঙ্গ রয়েছে। সেই অধ্যায়গুলি হল— একুশ তম অধ্যায়, বাইশ তম অধ্যায়, ঊনত্রিশ থেকে তেত্রিশ তম অধ্যায় এবং পঁয়ত্রিশ তম অধ্যায়। এই আট অধ্যায়ের মধ্যে ঊনত্রিশ থেকে তেত্রিশ মোট পাঁচ অধ্যায়ে রাসলীলা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত। কিন্তু মালাধর তাঁর কাব্যে গোপী প্রসঙ্গের কথা ও রাসলীলার কাহিনি অনেক সংক্ষেপিত আকারে উপস্থাপিত করেছেন। জানা যায় যে, বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা প্রাধান্য পেয়েছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে। তার আগে কৃষ্ণকথায় মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা প্রাধান্য পেত। চৈতন্যের আগে বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণই ছিল মুখ্য। গোপীরা ছিল কৃষ্ণ প্রেমের উপলক্ষ্য মাত্র। চৈতন্যের প্রভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং কৃষ্ণলীলা রাধা ব্যতীত জমাট বাঁধে নি। এই জন্যেই হয়তো মালাধরের কাব্যে গোপীলীলা প্রাধান্য পায় নি।

কাহিনি নির্মাণে কবি যে যে বিষয় সংযোজন করেছেন, যে যে বিষয় বিয়োজন করেছেন বা যে কাহিনির সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন তা কোথাও অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয় নি। যেহেতু অনুবাদ গ্রন্থ রূপেই এই কাব্যটি স্বীকৃত তাই কাহিনির জন্য মালাধর খুব বেশি প্রশংসার দাবী করতে না পারলেও ঘটনাসূত্র সংযুক্তিতে, চরিত্র চিত্রণ ও যুগবৈশিষ্টের সংযোগে কবি বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। মালাধরের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত লোকশিক্ষা। ভক্তিকে হৃদয়ে রেখে ভাগবত ধর্ম প্রচার করাই কবির লক্ষ্য ছিল। মনে হয় মালাধরের কাব্য বৈষ্ণব সমাজের বাইরে বৃহৎ জনসমাজে খুব একটা সমাদর পায় নি; যদি পেত তাহলে পরবর্তীকালে কোনো না কোনো কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা তাঁর নাম করতেন। কিন্তু কেউই তাঁর নাম করেন নি।

তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'মালাধর বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৩৩।

২. ঐ, পৃষ্ঠা – ১।

৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ভূমিকা- Lxvi।

৪. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩।

৫. ঐ, পৃষ্ঠা – ২৬।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ২৮।

৭. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', দ্বিতীয় খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, একাদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১০৭৫।

৮. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩০।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩২।

১০. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৬।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৯।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা – ৪১।

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩।

১৪. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', দ্বিতীয় খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, একাদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১০৯৭।

১৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন সম্পাদিত : 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, দ্বাদশ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১৬, অক্টোবর ২০০৯, পৃষ্ঠা – ১৮৫।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ১৮৫।

১৭. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত : 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪০৯/জানুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা – ১৭৩।

১৮. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৪৫।

১৯. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', দ্বিতীয় খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, একাদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১১২২।

২০. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৫৫।

২১. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৫৬।

২২. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : 'মালাধর বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৭৫।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৭।

২৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত : 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ ১৪০৯/জানুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা – ১৯৮।

২৫. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু'র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৯৯।

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৯।

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১১।

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৪।

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৪।

৩০. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', দ্বিতীয় খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, একাদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১২৪০।

৩১. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১১৫।

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৮-১১৯।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা – ১৬৭।

৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা – ২৫৫।

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩১২।

৩৬. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) : 'শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ', দ্বিতীয় খণ্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর (ইউ.পি), প্রধান কার্যালয়-- গোবিন্দ ভবন, ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, একাদশ সংস্করণ, প্রকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৪৯০।

৩৭. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৯৫।

৩৮. চক্রবর্তী, শ্রীনটবর (সম্পাদিত) : 'মাধবাচার্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', বঙ্গবাসী, ৬ নং ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ— ১৩৩৩ সাল, পৃষ্ঠা – ২১২।

৩৯. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৪৩০।

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩০।

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা – ৬১৮।

৪২. সেন, নবীনচন্দ্র : 'শ্রীমদ্ভগবত গীতা', সান্যাল এণ্ড কোং, ২৫ নং রায়বাগান স্ট্রিট, কলিকাতা-১২, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৯, পৃষ্ঠা – ১৩১।

৪৩. মিত্র, শ্রীখগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : মালাধর বসু-র 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ৪৮ নং হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৯৫।

৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৪২।

৪৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪৬।